স্মৃতিতে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

লুৎফর রহমান শাওন

উপমহাদেশের প্রখ্যাত সাহিত্যিক, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম কলমবন্ধু দুই বাংলার অত্যন্ত প্রিয় মানুষ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় চলে গেলেন অন্যভূবনে, অচেনা কোন দেশে। তাঁর মৃত্যুতে আমরা শোকাহত। বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার মাদারীপুরের সেই ছোট ছেলেটি দেশ ছেড়েছিলেন দেশবিভাগের সময়। তারপর আস্তে আস্তে সেই দিনের সেই ছোট শিশুটি একদিন হয়ে উঠলেন বাংলা সাহিত্যের সম্রাট, মহানায়ক। সাহিত্যের সব অঙ্গনেই যার ছিল আগাত বিচরণ। লিখেছেন কবিতা, গল্প, নাটক, উপন্যাস, রম্যরচনা ভ্রমণকাহিনী প্রভৃতি।

তাঁর মৃত্যুতে এসেছে দুই বাংলার সাহিত্যাঙ্গনে গভীর শোকের ছায়া। শোকাহত দুই বাংলার মানুষ। সুনীল দার প্রতি আমাদের নাড়ীর টান এতোটাই গভীর ছিল যে মনে হতো তিনি বাংলাদেশের মানুষ-জন্মস্থানের কারণেই এই দেশটির প্রতি তাঁরও ছিল গভীর মমতাবোধ, আন্তরিক ভালবাসা। সুনীল দার মৃত্যুর পর তাঁকে নিয়ে বিস্তর লেখালেখি হয়েছে এখনও হচ্ছে। স্মৃতিচারণ করে সারা বিশ্বের বাঙালীরা তাদের প্রিয় মানুষটি নিয়ে লেখালেখি করছেন। জানা অজানা অনেক তথ্যে সম্বৃদ্ধ হচ্ছে তাঁর সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের পরিধি। তাইতো শ্রদ্ধাবোধের সিক্ততায় তিনি আরও মহিমান্বিত, আরও জীবন্ত। মানুষতো চলে যায় সীমাহীন কোন গগণে কিন্তু রেখে যায় তাঁর স্মৃতি, সৃজনশীল সৃষ্টিকর্ম, শুভানুধ্যায়ী, ভক্ত আর অনুরাগীদের। আমার স্মৃতির মাঝেও সুনীল দার বিচরণ প্রত্যক্ষ করি অহরহ। তাইতো আমার এই স্মৃতিচারণ,লেখালেখি তাঁকে নিয়ে।

১৯৮৫ সালের জানুয়ারী মাস। সাতচল্লিশটি কবিতা নিয়ে আমার প্রথম কাব্যগ্রন্থ "আপন দর্পণে তুমি" প্রকাশিত হলো। জাতীয়গ্রন্থ কেন্দ্রের মাধ্যমে বইটির বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বইটি প্রকাশের পরের বছরই তরুন উদীয়মান কবি হিসেবে আমার প্রথম কাব্যগ্রন্থটি কলকাতার বই মেলায় স্থান পেল। বই মেলার কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আমন্ত্রন পেলাম। এই আমন্ত্রনপত্র যেন আমার কাছে অন্যরকমের অভিজ্ঞতা আর অনুভূতির নির্যাস। আনন্দে আত্মহারা -অনেকটা দিশেহারা। আমার সাথে সেই বছর আরও অনেক গুনী বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যিক, প্রকাশক আমন্ত্রিত হয়েছিলেন কলকাতার বই মেলায়। আমি তখন ঢাকা থেকে প্রকাশিত একটি মাসিক কাগজের সম্পাদক, সেই সাথে বেশ কিছু কাগজে নিয়মিত লেখালেখি করি। যথাসময়ে কলকাতা বই মেলায় উপস্থিত হয়ে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে সম্মানীত হলাম। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে কলকাতা এবং বাংলাদেশের প্রখ্যাত কবি-সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীদের পদচারণায় মুখরিত মেলা প্রাঙ্গন। হাজার হাজার মানুষের ভীড়। এই ভীড়ে আমি নিতান্তই একজন তুচ্ছ কবি। মেলার একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত দৌড়ঝাপ-ছোটাছুটি যেন অস্থির একটা ভাব। এই মেলাতেই প্রথম পরিচিত হলাম সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সাথে। তিনি আমার বইটির ভূয়সী প্রশংসা করে উৎসাহ দিলেন। অল্পকথার মধ্যেই আমি তাঁর মাঝে আন্তরিকতা খুঁজে পেলাম। আমার সম্পাদিত মাসিক কাগজের একটি কপি দিয়ে তাঁর একটি সাক্ষাৎকারের ইচ্ছা প্রকাশ করার সাথে সাথেই তিনি তাঁর আনন্দবাজার পত্রিকা অফিসে আমাকে আমন্ত্রন জানালেন।

পরের দিন একজন ফটোগ্রাফার নিয়ে যথাসময়ে আনন্দবাজার পত্রিকার অফিসে হাজির হলাম। ভয়ে বুক কাঁপছে এমন একজন সাহিত্য বিষারদের সাক্ষাৎকার নিতে কি প্রশ্ন করবো, কি জানতে চাইবো ভাবছি। এর আগে কয়েকবার প্রশ্নগুলো কাগজের পাতায় লেখার চেষ্টা করেও ব্যর্থ। তবে তাকে প্রশ্ন করার মতো অনেক প্লট আমার মাথায় গিজগিজ করছিল। শুধু সাজিয়ে বলতে পারলেই হলো।

অভ্যর্থণা কেন্দ্রে যাওয়ার সাথে সাথেই বুঝলাম তিঁনি আমাদের আগমন সম্পর্কে সেখানে আগে থেকেই সব বলে রেখেছেন। ভিআইপি গেষ্টের আদলে একজন পিয়ন আমাদের সুনীল দার কক্ষ পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে এলেন। সুনীল দা হাতের সব কিছু রেখে আমাদের জন্যই যেন অপেক্ষা করছিলেন। তাঁর আন্তরিক আতিথেয়তায় মুগ্ধ হলাম। চোখ ফেরালাম সুনীল দার রুমের চারিদিকে। সারি সারি বই, হাতে আঁকা ছবি- টেবিলের উপর সাজানো পান্ডুলিপির স্তুপ।

তাঁরপর শুরু হলো বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান কবি কথাসাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সাথে দীর্ঘ সময়ের আড্ডা। তাঁকে যে সব প্রশ্ন করবো বলে স্থির করেছিলাম তার সবই সুনীল দার সাথে আড্ডায় জানা হয়ে গেল। আসলে যা জানতে চেয়েছিলাম তাঁর চেয়েও বেশী জানা হলো।

জন্মের পর সুনীল দা শৈশবের কিছুটা সময় মাদারীপুর জেলার মাইজপাড়া গ্রামে কাটলেও দেশবিভাগের কারণে সপরিবারে বাকীটা জীবন কাটিয়েছেন কলকাতায়। ছোটবেলায় বন্ধুদের নিয়ে পাটক্ষেতে দৌড়াদৌড়ি, পুকুর জলে সাতার কাটা, কাগজের নৌকা পানিতে ভাসিয়ে দেয়ার স্মৃতিগুলো তাঁর সব মনে আছে। লেখালেখির শুরু কলকাতায় হলেও বাংলাদেশের স্মৃতি তাঁকে সবসময় তাড়িয়ে বেড়াত।

ছাত্রজীবনের কথা বলতে গিয়ে বলেছিলেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতার শিকার হয়েছিলেন তাঁর বাবা। স্কুলের মাইনা বন্ধ। বেসরকারী স্কুলের ছাত্রদের কাছ থেকে চাঁদা তুলে শিক্ষকদের বেতন দেয়া হতো। বাংলাদেশে থাকা অবস্থায় মাইজপাড়ার বীরমোহন বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন তিনি। টিনের চালের স্কুলের পাশে ছিল দীঘি। দীঘির টলমলে জলভরা রূপ তাঁকে খুব আকৃষ্ট করতো।

সুনীল দা-র বই পড়ার সাথে কান্নার একটি অভ্যাস ছিল। বইয়ের মধ্যে -গল্পের মধ্যে কষ্ট থাকলে তিনি কাঁদতেন। তিনি অনেক কষ্ট দেখতে দেখতেই যেন বড় হয়েছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ দেখেছেন, দুর্ভিক্ষ দেখেছেন, দাঙ্গা দেখেছেন। সেই দাঙ্গার বীভৎস রূপ দেখেছেন। যে দাঙ্গায় একসময়ের প্রতিবেশী বন্ধুও হঠাৎ অবিশ্বাসী, হিংসাত্মক, ভয়াবহ নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছিলেন। দাঙ্গায় নিরীহ মানুষের মৃত্যু দেখেছেন। বাড়ি-ঘর ধ্বংস করার দৃশ্য তাঁর সবই মনে আছে। দেশবিভাগ দেখেছেন। সে অভিজ্ঞতার কথা বলতে বলতে তিনি আবেগাপ্লুত হয়েছিলেন। সেটাও ছিল অনেক কষ্টের, অনেক করুন এবং ভয়াবহ। এসব কষ্ট ভুলতেই তিনি এক সময় শান্তির মানুষ হয়ে উঠতে চেয়েছিলেন। কষ্টের কথা , শান্তির কথা, ভালবাসার কথা লিখেছেন তাঁর কাব্যে, গ্রন্থে, উপন্যাসের পাতায় পাতায়।

বাংলাভাষার অধিকার অর্জন এবং কষ্টার্জিত আমাদের স্বাধীনতার মূল্যায়ন করতে গিয়ে দৃঢ় কণ্ঠে বলেছিলেন বাংলাদেশের সামনের পথ দৃপ্ত, উজ্জ্বল, আলোকিত কারণ সংগ্রাম আর ত্যাগের মধ্যদিয়ে অর্জিত স্বাধীনতা তার স্বীয় আসনে থাকবে চীরকাল। এটাই ছিল তার প্রত্যয়, বিশ্বাস ও আকাঙ্খা। তিনি সকল কুসংস্কার থেকে মুক্তির পথে আলো দেখাতে চেয়েছেন সবাইকে। স্বাধীনতার চলাকালীন সময়ে তিনি কলকাতার বিভিন্ন শরনার্থী শিবিরে ঘুরে ঘুরে তাদের কথা লিখেছেন, মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রাণিত করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি সাংবাদিক নই কিন্তু সংবাদপত্রের মানুষ, কবি-সাহিত্যিক। স্বাধীনতার সময় তাঁর কলমের এক একটি শব্দ যেন এক একটি বুলেটের মতো বিস্ফোরিত হয়েছে মানুষের মধ্যে।

সুনীল দা চলে গেলেন। রেখে গেলেন অনেক স্মৃতি। শোকাহত হৃদয়ে মানুষের ভালবাসার যে স্রোত বইছে সবদা- এর চেয়ে বড় পাওয়া আর কি হতে পারে। এই লেখক নোবেল পুরষ্কার সম্পর্কে বলেছিলেন, আমি নোবেল পুরষ্কার চাইনা -আমি চাই মানুষের ভালবাসা। মানুষের ভালবাসার চাইতে বড় কিছু নেই। আমরা বাংলা সাহিত্যের অন্যতম এই কবি, কথাসাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে গভীর শোকাহত। আমরা তাঁর আত্মার শান্তি ও মঙ্গল কামনা করি। তার সৃষ্টিকর্মের মাঝেই দুই বাংলায় তিনি বেঁচে থাকবেন চীরদিন।

লুৎফর রহমান শাওন / সিডনি থেকে প্রকাশিত প্রথম বাংলা সাপ্তাহিক স্বদেশ বার্তার সাবেক সম্পাদক